প্রথম আলো
28 DEC 2013
১০ ৩

মাতৃভাষায় শিক্ষা ■ সৌমিত্র শেখর

বাস্তবায়নভিত্তিক পরিকল্পনা চাই

নতুন বছরের সূচনাতেই বাংলাদেশের ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীর শিশুদের মাতৃভাষায় পাঠ্যপুস্তক সরবরাহ এবং তা পঠন-পাঠনের উপযুক্ত শিক্ষা-পরিবেশ তৈরি হোক—এমন দাবি উঠেছে। দাবি বা প্রত্যাশাটি নিশ্চয়ই শুভ এবং যৌক্তিক। কারণ, মানুষ সবচেয়ে সুন্দর স্বপ্নটি দেখে তার মাতৃভাষায়। কিন্তু পরিকল্পনা ও সিদ্ধান্ত বাস্তব অবস্থা বিবেচনা না করে নিলে তা বাস্তবায়নের মুখ দেখে না। সোনার পাথরবাটি বা কাঁঠালের আমসত্ত্ব বলে বাংলায় যে বাগ্‌ধারা আছে, এসব অবাস্তবতা বোঝাতেই সেগুলো ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

বাংলাদেশ জনবহুল, কিন্তু সে তুলনায় এর সম্পদ সীমিত। বাঙালি জাতির প্রাধান্য হলেও কমপক্ষে ৪০টি ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীর বাস এই দেশে। ক্ষুদ্র জাতিগুলোর ভাষাও ভিন্ন, জনসংখ্যা নানা রকম। যেমন, চাকমাদের জনসংখ্যা বেশি, প্রায় তিন লাখের মতো। কিন্তু খিয়াংদের সংখ্যা অনেক কম, প্রায় আড়াই হাজার। সংখ্যার এই তারতম্য তো আছেই, তার ওপর তাদের অনেকের বাসও স্বাভাবিক লোকালয় থেকে দূরে, দুর্গম এলাকায়। এই জনগোষ্ঠীর দু-একটির মাত্র ভাষা প্রকাশের সম্পূর্ণ লিপি বা হরফ আছে; বেশির ভাগেরই লিপি নেই। পাঠ্যপুস্তক রচনা করতে হলে তো আগে লিপি বা হরফ চাই—কোন লিপি গ্রহণ করবে তারা? এ বিষয়গুলো সামনে রেখে ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীর শিশুদের মাতৃভাষায় পাঠ্যপুস্তক রচনা ও পঠন-পাঠনের বিষয়টি বিবেচনা করা জরুরি। ২০১৪ সালের জানুয়ারিতে চাকমা, মারমা, ত্রিপুরা, গারো, সাদ্রি—এই পাঁচটি ভাষায় প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা চালু করার সরকারি সিদ্ধান্ত থাকলেও এখনো বই রচনা সম্পূর্ণ হয়নি বলে জানা যায়। কেন রচিত হয়নি—এর সংগত কারণগুলো গভীরভাবে অনুধাবন করতে হবে। সাঁওতালরা কোন লিপি ব্যবহার করবে, এই সিদ্ধান্তই হয়নি; অথচ জনসংখ্যায় তারা উল্লেখ করার মতো। বিদেশি অর্থে পরিচালিত কতিপয় এনজিও প্রায়ই ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীর মাতৃভাষায় পঠন-পাঠন বিষয়ে বক্তব্য উল্লেখ করে, কিন্তু লিপির প্রশ্নটি তারা সামনে আনতে চায় না। অথচ, লেখাপড়ার ক্ষেত্রে লিপির প্রসঙ্গ আসবে সর্বাগ্রে। লিপির প্রসঙ্গটি অমীমাংসিত রেখে লিখিত পাঠ্যবই প্রণয়নের আলোচনা আকাশকুসুম বাকবিস্তার মাত্র।

অধিকাংশ ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠীর ভাষার লিপি নেই, কোনো কোনো জনগোষ্ঠীর সব মিলিয়ে মাত্র ১০ বা তার কম লিপি আছে। তারা কীভাবে মাতৃভাষা লিখবে বা পড়বে? তাই আগে দেখা প্রয়োজন, ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীর শিশুদের মাতৃভাষায় শিক্ষাদানের ব্যাপারে বিদেশি অর্থে পরিচালিত এনজিও, সরকার এবং যারা এই জাতিগোষ্ঠীভুক্ত এই তিন পক্ষ সর্বোচ্চ পরিমাণে আন্তরিক কি না। প্রায়ই দেখা যায়, প্রথম পক্ষটির আন্তরিকতার অভাব। এটিই অনেক সময় সরকারি সিদ্ধান্তকে বিলম্বিত করার ক্ষেত্রে কাজ করে। ২০১৪ সালের জানুয়ারিতে চাকমা, মারমা, ত্রিপুরা, গারো, সাদ্রি ভাষায় প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা চালু করার সরকারি সিদ্ধান্ত গ্রহণের পেছনে কাজ করেছে প্রধানত এনজিওগুলো। তাদের দাবির পরিপ্রেক্ষিতেই মূলত এ সিদ্ধান্ত হয়েছে। লক্ষ করার ব্যাপার, বাংলাদেশের ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীর মধ্যে এই পাঁচটি মোটামুটিভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠ অর্থাৎ সংখ্যালঘুর সংখ্যাগুরু। এরা আবার ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে ঢাকাসহ দেশের অন্যান্য শহরাঞ্চলেও। এদের অনেকের সন্তান বাংলা ও ইংরেজি মিডিয়ামে লেখাপড়া করে; অনেকে মেধা বা কোটায় দেশের উচ্চ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে লেখাপড়া এবং চাকরি নিশ্চিত করেছে। অর্থাৎ শিক্ষা ও সংস্কৃতিতে এই জনগোষ্ঠীতে মিশ্রণ ঘটেছে বা একাধিক ধারা সৃষ্টি হয়ে গেছে ইতিমধ্যে। তাই আজ চাকমাদের জন্য মাতৃভাষায় শিক্ষাদান বা গারোদের (মান্দি) জন্য মাতৃভাষায় লেখাপড়ার উদ্যোগ গ্রহণ পদক্ষেপ হিসেবে সুন্দর শোনাবে ও মহান কর্ম বলে মনে হবে হয়তো, কিন্তু এর সার্বিক বাস্তবায়ন সম্ভবপর হবে না। বরং মাতৃভাষায় শিক্ষাদানের আয়োজন করে শত শত ক্ষুদ্র জাতিশিশুকে এ ধরনের প্রতিষ্ঠানে অধ্যয়নের জন্য এনে দু-চার বছর পর সেসব প্রতিষ্ঠান বন্ধ হয়ে গেলে তা অসন্তোষ তো ছড়াবেই, তার চেয়ে বড় কথা, তা হবে ওই শিশুদের জীবন অন্ধকার করে দেওয়ার শামিল। এ প্রসঙ্গে পার্বত্য চট্টগ্রামবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব নব বিক্রম কিশোর ত্রিপুরা প্রদত্ত একটি তথ্য স্মরণ করা যেতে পারে। তিনি বলেছেন : 'ইউএনডিপির অর্থায়নে পরিচালিত ৩৩২টি স্কুল অর্থসংকটের কারণে বন্ধ হতে চলেছে। কয়েক হাজার শিক্ষার্থীর ভাগ্য অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে।' (প্রথম আলো, ২২ ডিসেম্বর, ২০১৩)। এই তথ্যটি পুরো বাস্তবতার সহস্রাংশ মাত্র।

তাই এ দেশের ক্ষুদ্র জাতির জন্য প্রয়োজন, বাস্তবায়নভিত্তিক একটি ভাষা ও শিক্ষা পরিকল্পনা, যা প্রণীত হবে সব পক্ষের মত নিয়েই। ভাষা ও শিক্ষা পরিকল্পনার আগে 'বাস্তবায়নভিত্তিক' কথাটির ওপর জোর দিতে চাই। কথার ফুলঝুরি সাজিয়ে আপাতত সম্মোহন করা হয়তো সম্ভব হয়, কিন্তু তা প্রকৃত কাজে আসে না। এ ক্ষেত্রে পার্শ্ববর্তী মেঘালয় রাজ্য আমাদের দৃষ্টান্ত হতে পারে। সেখানে লিপিহীন বা স্বল্পলিপির ভাষাগুলোকে এক লিপিতে আনা হয়েছে। আমাদের দেশেও এ ক্ষেত্রে ইংরেজি লিপিকে গ্রহণ করা যেতে পারে। আর মাতৃভাষায় পাঠ্যপুস্তক রচনা করার ক্ষেত্রে প্রাথমিক নির্বাচন হিসেবে 'সংখ্যালঘুর সংখ্যাগুরু'কে প্রাধান্য না দিয়ে ধরা যেতে পারে জনসংখ্যায় অপেক্ষাকৃত কম ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীকে।

একটি উদাহরণ দেওয়া যাক : বাংলাদেশে খিয়াংদের জনসংখ্যা প্রায় আড়াই হাজার, চাকমাদের সংখ্যা তিন হাজারের সামান্য বেশি। এরা এখনো মিশ্র সংস্কৃতির কবলে পড়েনি। এ দুটি জাতিগোষ্ঠীর সব শিশুর মধ্যে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার জন্য তাদের মাতৃভাষায় যদি পুস্তক প্রণয়ন করা যায় এবং তা বাস্তবায়নভিত্তিক একটি ভাষা ও শিক্ষা পরিকল্পনা মোতাবেক প্রাতিষ্ঠানিকভাবে পরিচালনা করা সম্ভবপর হয়, তাহলে সেটা যেমন সফল হবে, তেমনি বোঝা যাবে, ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীকে মাতৃভাষায় শিক্ষাদানের ব্যাপারে ভবিষ্যতে আর কীভাবে অগ্রসর হওয়া উচিত। যেহেতু এসব ভাষার লিপি নেই সেহেতু মেঘালয়ের দৃষ্টান্ত অনুসারে ইংরেজি ভাষার লিপিতেই তাদের গ্রন্থ প্রণীত হতে পারে। এ ক্ষেত্রে বাঙালিদের আঁতকে ওঠার ব্যাপার নেই। কারণ, লক্ষ্য হলো ক্ষুদ্র জাতির শিশুদের তাদের মাতৃভাষায় শিক্ষা প্রদান—বাংলা ভাষা বা লিপির প্রসার নয়। বাংলার চেয়ে ইংরেজি ভাষার লিপিসংখ্যা ও লেখনজটিলতা কম বলে এটা সহজতর হবে।

● ড. সৌমিত্র শেখর : অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
scpcdu@gmail.com